অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গোনাহ্‌গার তার গোনাহ্ স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গোনাহ্ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করি নি, পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্ত-পদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে। বরং তাদের জিহ্বা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় মুখ ও জিহ্বাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহ্বাকে সত্যকথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে। واللّٰه اعلم

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ج وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ج اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা পত্নীও তাঁদের

উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রসূলে করীম (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মত ভার্যাকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যার ঈমান নেই, সে-ই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কোরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ)-এর বিবিগণ কাফির ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফির হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ ما بغت امرأة نبي قط ---অর্থাৎ কোন পয়গম্বরের বিবি কোনদিন ব্যভিচার করে নি। ---(দুররে মনসুর) এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরের বিবি কাফির হবে---এটা তো সম্ভবপর; কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে---এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর স্বাভাবিকভাবে ঘৃণার কারণে হয় না। ---(বয়ানুল কোরআন)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن
لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ
لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾
لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

(২৭) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা ভালোভাবে জানেন। (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে, এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই। এবং আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পঞ্চম বিধান অনুমতি গ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা ঃ সূরা নূরের শুরু থেকেই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা দমন করার জন্য এতদসম্পর্কিত অপরাধসমূহের শাস্তির বর্ণনা এবং বিনা প্রমাণে কারও প্রতি অপবাদ আরোপের নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব অশ্লীলতা দমন এবং সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য এমন বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্লজ্জতা সুগম হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী এসবের অন্যতম। অর্থাৎ কারও গৃহে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উঁকি দিয়ে দেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাহ্‌রাম নয় এমন নারীদের ওপর দৃষ্টি না পড়া এর অন্যতম রহস্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিভিন্ন প্রকার গৃহের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।

গৃহ চার প্রকার ঃ ১. নিজস্ব বাসগৃহ, যাতে অন্য কারও আসার সম্ভাবনা নেই; ২. যে গৃহে অন্য লোকও থাকে, যদিও সে মাহ্‌রাম হয় অথবা যাতে অন্যের আসার সম্ভাবনা আছে; ৩. যে গৃহে কারও কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা আছে; ৪. যে গৃহ কোন বিশেষ ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয়; যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ ইত্যাদি সাধারণের আসা-যাওয়ার স্থান। প্রথম প্রকার গৃহের বিধান তো সুপরিজ্ঞাত যে, এতে প্রবেশের জন্য কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে পরিষ্কারভাবে এই বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে ঃ) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের (বিশেষ বসবাসের) গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে (যাতে অন্য লোক বসবাস করে, সেসব গৃহ তাদের মালিকানাধীন হোক কিংবা বসবাসের জন্য ধার করা হোক কিংবা ভাড়া করা হোক) প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি লাভ না কর এবং (অনুমতি লাভ করার পূর্বে) গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। (অর্থাৎ প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করে জিজ্ঞেস কর যে, ভেতরে প্রবেশের অনুমতি আছে কি? বিনানুমতিতে এমনিতেই ঢুকে পড়ো না। যদিও কতক লোক অনুমতি নেয়াকে মর্যাদাহানিকর মনে করে; কিন্তু বাস্তবে) এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। (বিষয়টি তোমাদের এ জন্য বলা হলো,) যাতে তোমরা স্মরণ রাখ (এবং তদনুযায়ী আমল কর। এতে অনেক রহস্য আছে। এ হলো দ্বিতীয় প্রকার গৃহের বিধান)। যদি গৃহে কোন মানুষ নেই বলে মনে হয় (বাস্তবে থাকুক বা না থাকুক), তবে সেখানে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয়। (কেননা, প্রথমত সেখানে কেউ থাকার সম্ভাবনা আছে; যদিও তুমি জান না। বাস্তবে কেউ না থাকলেও অপরের খালি গৃহে বিনানুমতিতে ঢুকে পড়া তার মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল, যা জায়েয নয়। এ হল তৃতীয় প্রকার গৃহের বিধান।) যদি (অনুমতি চাওয়ার সময়) তোমাদেরকে বলা হয় (এখন) ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে আস। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, (সেখানে এই মনে করে অটল হয়ে থাকা যে, একবার তো বাইরে আসবে; তা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, এতে নিজের অবমাননা এবং অপরকে অহেতুক চাপ প্রয়োগ করে কষ্ট দেওয়া

হয়। কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম।) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজকর্মের খবর রাখেন। (বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি পাবে। এ বিধান তখনও যখন গৃহের লোকেরা ফিরে যেতে বলে না; কিন্তু হ্যাঁ, না-ও কিছুই বলে না। এমতাবস্থায় হয়তো শোনেনি এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে তিনবার অনুমতি চাওয়া যেতে পারে। এরপরও কোন জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে আসা উচিত; যেমন হাদীসে স্পষ্টত একথা বলা হয়েছে) এমন গৃহে (বিশেষ অনুমতি ব্যতীত) প্রবেশ করাও গোনাহ্ হবে না যাতে (বাসগৃহ হিসেবে) কেউ বাস করে না, এবং যাতে তোমাদের উপকার আছে। (অর্থাৎ এসব গৃহ ভোগ করার ও ব্যবহার করার অধিকার তোমাদের আছে। এ হলো চতুর্থ প্রকার গৃহের বিধান, যা জনহিতকর কাজের জন্য নির্মিত হয়। ফলে সেখানে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার থাকে)। তোমরা যা প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর, আল্লাহ্ তা'আলা তার সব জানেন। (কাজেই সর্বাবস্থায় তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি অপরিহার্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ঃ কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারও গৃহে প্রবেশ করো নাঃ পরিতাপের বিষয়, ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কোরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখাপড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গোনাহ্ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে; কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কোরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তন-কেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কোরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কোরআনের বিধানই নয়। ইন্না লিল্লাহ্......

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতাঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কোরআন পাক অমূল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেঃ

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারও হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে

কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেওয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও কষ্ট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎপ্রার্থীর। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোন ব্যক্তির ওপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকস্মাৎ বিপদ মনে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহ্‌রাম নয়, এমন নারীর ওপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলীকে কোর-আন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তির বিধি-বিধানে সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারও গোপন কথা জবরদস্তি জানার চেষ্টা করাও গোনাহ্ এবং অপরের জন্য কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাস'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাস'আলা পরে বর্ণিত হবে।

মাস'আলাঃ আয়াতে يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা পুরুষের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত; যেমন কোর-আনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতিপয় বিশেষ মাস'আলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীদের অভ্যাসও তাই ছিল। তাঁরা কারও গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রা) বলেনঃ আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশার গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম।—(ইবনে কাসীর)

মাস'আলাঃ এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারী, পুরুষ মাহ্‌রাম ও গায়র-মাহ্‌রাম সবাই

শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোন মাহ্‌রাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল ঃ আমি কি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ অনুমতি চাও। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্,! আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন ঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি। তিনি বললেন ঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশ্যযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে।—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হল যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে---পিতামাতা, ভাইবোন প্রমুখ থাকে না।

মাস'আলা ঃ যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে, তাতে প্রবেশ করার জন্য যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু মোস্তাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়। বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে হুঁশিয়ার করা দরকার। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ্ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন।---(ইবনে কাসীর) এক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী? তিনি বললেন ঃ না। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন ঃ এর অর্থ ওয়াজিব নয়। কিন্তু মোস্তাহাবও উত্তম এ ক্ষেত্রেও।

অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরীকা ঃ আয়াতে حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا বলা হয়েছে; অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারও গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম استيناس— শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে استيناس শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়---সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন কোন তফসীরকার এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময়

সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্রপশ্চাৎ নেই। তিনি আবূ আইউব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদি বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, কাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নত তরীকা ত্যাগ করেছে। ---(রূহুল মা'আনী) আবূ দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল : أألج আমি কি ঢুকে পড়ব? তিনি খাদেমকে বললেন : লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক : السلام عليكم أأدخل অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথা শুনে السلام عليكم أأدخل বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ---(ইবনে কাসীর) বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই উক্তি বর্ণনা করেছেন : —— لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না।---(মাযহারী) এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) দুটি সংশোধন করেছেন---প্রথমে সালাম করা উচিত এবং أأدخل এর স্থলে أألج শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা, أألج শব্দটি ولوج থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। মার্জিত ভাষার পরিপন্থী। মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

মাস'আলা : উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হযরত উমর ফারুক (রা) তাই করতেন। একবার তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দ্বারে এসে বললেন, السلام على رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر অর্থাৎ সালামের পর বললেন, উমর প্রবেশ করতে পারে কি?---(ইবনে কাসীর) সহীহ্ মুসলিমে আছে, হযরত আবূ মূসা হযরত উমরের কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য বললেন, السلام عليكم هذا ابو موسى السلام عليكم هذا الاشعرى এতেও তিনি

প্রথমে নিজের নাম আবূ মূসা বলেছেন, এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্বেগে জওয়াব দেয়া যায় না।

মাস'আলা ঃ এ ব্যাপারে কোন কোন লোকের পন্থা মন্দ। তারা বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চায়; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করে না। ভেতর থেকে গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করে, কে? উত্তরে বলা হয়, আমি। বলা বাহুল্য, এটা জিজ্ঞাসার জওয়াব নয়। যে প্রথম শব্দে চেনেনি, সে 'আমি' শব্দ দ্বারা কিরূপে চিনবে?

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরায় হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত মুগীরা ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে? উত্তর হল, আনা অর্থাৎ আমি। হযরত মুগীরা বললেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে তো কারও নাম 'আনা' নেই। এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস শুনালেন যে, একদিন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্য দরজার কড়া নাড়লেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে? উত্তরে জাবের 'আনা' বলে দিলেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে শাসিয়ে বললেন ঃ 'আনা' 'আনা' অর্থাৎ 'আনা' 'আনা' বললে কাউকে চেনা যায় নাকি?

মাস'আলা ঃ এর চাইতেও আরও মন্দ পন্থা আজকাল অনেক লেখাপড়া জানা লোকেরাও অবলম্বন করে থাকে। দরজায় কড়া নাড়ার পর যখন ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে? তখন তারা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে ---কোন জওয়াবই দেয় না। এটা প্রতিপক্ষকে উদ্বিগ্ন করার নিকৃষ্টতম পন্থা। এতে অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়।

মাস'আলা ঃ উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, দরজার কড়া নেড়ে নিজের নাম প্রকাশ করে বলে দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামনা করে--- অনুমতি চাওয়ার এ পন্থাও জায়েয।

মাস'আলা ঃ কিন্তু এত জোরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে শ্রোতা চমকে ওঠে, বরং মাঝারি ধরনের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌঁছে যায় এবং কোনরূপ কর্কশতা প্রকাশ না পায়। যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরজায় কড়া নাড়তেন তারা নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট না হয়। ---(কুরতুবী) অনুমতি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা। যারা এই উদ্দেশ্য বোঝে তারা আপনা-আপনি সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে জরুরী মনে করবে। প্রতিপক্ষ কষ্ট পায়, এমন বিষয়াদি থেকে তারা বেঁচে থাকবে।

জরুরী হুঁশিয়ারি ঃ আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব তরক করার গোনাহ্। যারা সুন্নত তরীকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত

যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌঁছা মুশকিল হয়। তাই বুঝে নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পন্থা প্রতি যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নরূপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পন্থা তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিভাবে যারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট শর্ত এই যে, ঘন্টা বাজানোর পর নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌঁছে। এছাড়া অন্য কোন পন্থা কোন স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েয। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পন্থা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

মাস'আলা ঃ যদি কেউ কারও কাছে অনুমতি চায় এবং উত্তরে বলা হয়, এখন সাক্ষাৎ হতে পারবে না—ফিরে যান, তবে একে খারাপ মনে না করা উচিত। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও চাহিদা বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে বাইরে না আসতে বাধ্য হয় এবং আপনাকেও ভেতরে ডেকে নিতে পারে না। এমতাবস্থায় তার ওযর মেনে নেওয়া উচিত। উল্লিখিত আয়াতেরও নির্দেশ তাই। বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ অর্থাৎ যখন আপনাকে আপাতত ফিরে যেতে বলা হয়, তখন আপনার হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। পরবর্তীকালের জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি সারা জীবন এই আশায় ছিলাম যে, কারও কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং সে আমাকে জওয়াবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি ফিরে এসে কোরআনের এই আদেশ পালনের সওয়াব হাসিল করি; কিন্তু হায়, এই নিয়ামত কখনও আমার ভাগ্যে জুটল না।

মাস'আলা ঃ ইসলামী শরীয়ত সুন্দর সামাজিকতা শিক্ষা দিয়েছে এবং সবাইকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য দ্বিমুখী সুষম ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এই আয়াতে যেমন আগন্তুককে অনুমতি না দিলে এবং ফিরে যেতে বললে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে এক হাদীসে এর অপর পিঠ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ان لزورك عليك حقا অর্থাৎ সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিরও আপনার উপর হক আছে। তাকে কাছে ডাকুন, বাইরে তার সাথে মোলাকাত করুন, তার সম্মান করুন, কথা শুনুন এবং গুরুতর অসুবিধা ও ওযর ছাড়া সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করবেন না। এটাই তার হক।

মাস'আলা ঃ কারও দরজায় অনুমতি চাইলে যদি ভেতর থেকে জওয়াব না আসে, তবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়া সুন্নত। যদি তৃতীয়বারও জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসারই নির্দেশ আছে। কারণ তৃতীয়বার বলতে এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আওয়াজ শুনেছে ; কিন্তু নামাযরত থাকা অথবা গোসলরত থাকা অথবা পায়খানায় থাকার কারণে সে জওয়াব দিতে পারছে না। কিংবা এক্ষণে তার সাক্ষাতের ইচ্ছা নেই। উভয় অবস্থায় সেখানে অটল হয়ে থাকা এবং অবিরাম কড়া নাড়াও কষ্টের কারণ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষ্যই কষ্ট দান থেকে বেঁচে থাকা।

হযরত আবূ মূসা আশআরী বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সা) বললেন ঃ اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع — অর্থাৎ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসা উচিত।---(ইবনে কাসীর) মসনদে আহমদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সাদ ইবনে ওবাদার গৃহে গমন করলেন এবং বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম করলেন। হযরত সা'দ সালামের জওয়াব দিলেন ; কিন্তু খুবই আস্তে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) না শোনেন। তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সালাম করলেন। হযরত সা'দ প্রত্যেকবার শুনতেন এবং আস্তে জওবার দিতেন। তিনবার এরূপ করার পর তিনি ফিরে আসলেন। সা'দ যখন দেখলেন যে, আওয়াজ আসছে না, তখন গৃহ থেকে বের হয়ে পিছনে দৌড় দিলেন এবং ওযর পেশ করে বললেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমি প্রত্যেকবার আপনার আওয়াজ শুনেছি এবং জওয়াবও দিয়েছি, কিন্তু আস্তে দিয়েছি, যাতে আপনার পবিত্র মুখ থেকে আমার সম্পর্কে আরও বেশি সালামের শব্দ উচ্চারিত হয়। এটা আমার জন্যে বরকতময়। অতঃপর তিনি তাকে সুন্নত বলে দিলেন যে, তিনবার জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত। এরপর হযরত সা'দ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গৃহে নিয়ে যান এবং কিছু খাবার পেশ করেন। তিনি তা কবূল করেন।

হযরত সা'দের এই কার্য ছিল অধিক ইশ্ক ও মহব্বতের প্রতিক্রিয়া। তখন তিনি এদিকে চিন্তাও করেন নি যে, দু'জাহানের সরদার হুযুর পাক (সা) দরজায় উপস্থিত আছেন। কালবিলম্ব না করে তাঁর পদচুম্বন করা উচিত। বরং তাঁর চিন্তাধারা এদিকে নিবদ্ধ ছিল যে, রসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে আমার উদ্দেশে যত বেশি 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দ উচ্চারিত হবে, আমার জন্য তা ততবেশি কল্যাণকর হবে। মোট কথা, এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জওয়াব না আসলে ফিরে যাওয়া সুন্নত। সেখানেই অটল হয়ে বসে যাওয়া সুন্নত বিরোধী এবং প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক।

মাস'আলা ঃ এই বিধান তখনকার জন্য, যখন সালাম, কড়া নাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে অনুমতি লাভ করার জন্য তিন বার চেষ্টা করা হয়। তখন সেখানে অনড় হয়ে বসে যাওয়া কষ্টদায়ক। কিন্তু যদি কোন আলিম অথবা বুযুর্গের দরজায় অনুমতি চাওয়া

ব্যতীত ও খবর দেওয়া ব্যতীত এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, অবসর সময়ে বাইরে আগমন করলে সাক্ষাৎ করবে, তবে তা উপরোক্ত বিধানের মধ্যে দাখিল নয়; এবং এটাই আদব ও শিষ্টাচার। স্বয়ং কোরআন নির্দেশ দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গৃহাভ্যন্তরে থাকেন, তখন তাঁকে আওয়াজ দিয়ে আহ্বান করা আদবের খেলাফ; বরং এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন মুতাবিক বাইরে আগমন করেন, তখন সাক্ষাৎ করা উচিত। আয়াত এই: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ —হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: মাঝে মাঝে আমি কোন আনসারী সাহাবীর দরজায় পূর্ণ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করি, যাতে তিনি বাইরে আগমন করলে তাঁর কাছে কোন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি যদি তাঁর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতাম, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু আমি একে আদবের খেলাফ মনে করি। তাই অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করে নেই।—(বুখারী)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ — مَتَاعٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া। যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাকেও مَتَاعٌ বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে। অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্থাৎ ভোগ করার অধিকার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়, তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন: ইয়া রসূলাল্লাহ্! এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরায়শদের ব্যবসাজীবী লোকেরা কি করবে? মক্কা ও মদীনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোন স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায়? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়—(মাযহারী)। শানে নুযূলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ্, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

মাস'আলা ঃ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে স্থানে প্রবেশের জন্য মালিক অথবা মুতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, সেগুলো পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। উদাহরণত রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে টিকিট ব্যতীত যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই প্লাটফর্ম-টিকিট নেওয়া জরুরী; এর বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ। বিমান বন্দরের যে অংশে যাওয়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিষিদ্ধ, সেখানে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া শরীয়তে নাজায়েয।

মাস'আলা ঃ এমনিভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যেসব কক্ষ ব্যবস্থাপক অথবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট; যেমন এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কক্ষ, অফিস গৃহ ও কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদিতে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া নিষিদ্ধ ও গোনাহ্।

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরও কতিপয় মাস'আলা

পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর আসল উদ্দেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাস'আলাসমূহও জানা যায়।

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাস'আলা ঃ কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোন দরকারী কাজ অথবা নামাযে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সম্বোধন করা জায়েয নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাস'আলা ঃ যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত।

o টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরম্ভ করব। কারণ, প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারী কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোন নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।

o কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনরূপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায়? এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ان لزورك عليك حقا অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার ওপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার জওয়াব দিন।

০ কারও গৃহে পৌঁছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে আপনি অবগত না হউন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।—(বুখারী, মুসলিম) রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন, তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীতে না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম থাকত; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশংকা থাকত। —(মাযহারী)

০ উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায়। যদি দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত।—(মাযহারী)

০ যাকে কেউ দূত মারফত ডেকে পাঠায়, সে যদি দূতের সাথেই এসে যায়, তবে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই; দূতের আগমনই অনুমতি। তবে যদি কিছুক্ষণ পরে আসে, তবে অনুমতি নেওয়া জরুরী। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: اذا دعى احدكم فجاء مع الرسول فان ذالك له اذن অর্থাৎ যাকে ডেকে পাঠানো হয়, সে যদি দূতের সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার ভেতরে আসার অনুমতি। —(আবূ দাউদ, মাযহারী)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ
اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ
مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۠ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۗىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۗءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۗىِٕهِنَّ
اَوْ اَبْنَاۗءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ
اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۗىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي
الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰي عَوْرٰتِ النِّسَاۗءِ ۠

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

(৩০) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(নারীদের পর্দা সম্পর্কিত ষষ্ঠ নির্দেশ) আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন: তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয, সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয, সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে (অর্থাৎ অবৈধ পাত্রে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না করে। ব্যভিচার ও পুংমৈথুন সব এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। (এর খেলাফ করলে, হয় ব্যভিচার, না হয় ব্যভিচারের ভূমিকায় লিপ্ত হবে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ অবহিত আছেন যা কিছু তারা করে। (সুতরাং বিরুদ্ধাচরণ-কারীরা শাস্তিযোগ্য হবে) আর (এমনিভাবে) মুসলমান নারীরদেকে বলে দিন: তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে। (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয, সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। (ব্যভিচার, পারস্পরিক কোলাকুলি সব এর অন্তর্ভুক্ত) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রদর্শন না করে। ('সৌন্দর্য' বলে গহনা; যেমন কংকন, চুড়ি, পায়ের অলংকার, বাজুবন্দ, বেড়ী, ঝুমুর, পট্টি, বালি ইত্যাদি এবং 'সৌন্দর্যের স্থান' বলে হাত, পায়ের গোছা, বাহু, গ্রীবা, মাথা, বক্ষ, কান বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব স্থান সবার কাছ থেকে গোপন রাখবে, সেই ব্যতিক্রমদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, যা পরে বর্ণিত হবে। এসব স্থানকে বেগানাদের কাছ

থেকে গোপন রাখা ওয়াজিব এবং মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। পরে একথা বর্ণিত হবে। অতএব দেহের অন্যান্য অঙ্গ---যেমন পিঠ, পেট ইত্যাদি আবৃত রাখাও আয়াতদৃষ্টে ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ, এগুলো মাহরামের সামনেও খোলা জায়েয নয়। সারকথা এই যে, নারীরা যেন তাদের আপাদমস্তক আবৃত রাখে। উপরোক্ত দু'টি ব্যতিক্রমের প্রথমটি প্রয়োজনের খাতিরে ব্যক্ত হয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন কাজকর্মে যেসব অঙ্গ খোলার প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বিবরণ এরূপঃ) কিন্তু যা (অর্থাৎ যে সৌন্দর্যের স্থান সাধারণত) খোলা (ই-) থাকে (যা আবৃত করার মধ্যে সার্বক্ষণিক অসুবিধা রয়েছে। এরূপ সৌন্দর্যের স্থান বলে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এবং বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী পদযুগলও বোঝানো হয়েছে। কেননা মুখমণ্ডল তো প্রকৃতিগতভাবেই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও কোন কোন সাজসজ্জা এতে করা হয়; যেমন সুরমা ইত্যাদি। হাতের তালু, অঙ্গুলি মেহদী ও আংটির স্থান। পদযুগলও আংটি ও মেহদীর স্থান। এসব স্থান না খুলে কাজকর্ম সম্ভবপর নয় বলেই এগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে مَا ظَهَرَ--এর তফসীরে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালু উল্লেখ করা হয়েছে। ফিকহ্‌বিদগণ কারণের ভিত্তিতে অনুমান করে পদযুগলকে এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন) এবং (বিশেষ করে তারা যেন খুব যত্ন সহকারে মাথা ও বক্ষ আবৃত করে এবং) তাদের ওড়না (যা মাথা আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয়) বক্ষদেশে ফেলে রাখে (যদিও বক্ষদেশ জামা দ্বারা আবৃত হয়ে যায়; কিন্তু প্রায়ই জামার বোতাম খোলা থাকে এবং বক্ষের আকৃতি জামা সত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন আছে। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম বর্ণিত হচ্ছে। এতে মাহরাম পুরুষদেরকে পর্দার উল্লিখিত বিধান থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে (অর্থাৎ সৌন্দর্যের উল্লিখিত স্থানসমূহকে কারও কাছে) প্রকাশ না করে; কিন্তু স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়) ভ্রাতা, (চাচাত, মামাত ইত্যাদি ভ্রাতা নয়) ভ্রাতুষ্পুত্র, (সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া) ভগ্নিপুত্র, (চাচাত, খালাত বোনদের পুত্র নয়) নিজেদের (ধর্মে শরীক) স্ত্রীলোক (অর্থাৎ মুসলমান স্ত্রীলোক। কাফির স্ত্রীলোক বেগানা পুরুষের মতই) বাঁদী (কাফির হলেও; কেননা পুরুষ ক্রীতদাসের বিধান ইমাম আবূ হানীফার মতে বেগানা পুরুষের মত। তার কাছেও পর্দা ওয়াজিব), এমন পুরুষ যারা (শুধু পানাহারের জন্য) সেবক (হিসাবে থাকে এবং ইন্দ্রিয় সঠিক না হওয়ার কারণে) মহিলাদের প্রতি উৎসাহী নয়। [বিশেষভাবে এদের কথা বলার কারণ এই যে, তখন এ ধরনের লোকই বিদ্যমান ছিল। (দুররে-মনসূর) প্রত্যেক নির্বোধ ব্যক্তির বিধান তাই। কাজেই এই বিধানটি নির্বোধ হওয়ার ওপর ভিত্তিশীল, সেবক হওয়ার ওপর নয়। কিন্তু তখন যারা সেবক ছিল, তারা এমনি ছিল। তাই তাবে' তথা সেবক উল্লেখ করা হয়েছে। যারা বোধশক্তির অধিকারী, তারা বৃদ্ধ খোজা অথবা লিঙ্গকর্তিত হলেও বেগানা পুরুষ। তাদের কাছে পর্দা ওয়াজিব।] অথবা এমন বালক যারা নারীদের গোপন

অঙ্গ সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ (অর্থাৎ যেসব বালক এখনও পর্যন্ত সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং কামভাব সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপরোক্ত সবার সামনে মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়ের তালু ও পদযুগল ছাড়াও সাজসজ্জার উল্লিখিত স্থানসমূহ প্রকাশ করাও জায়েয; অর্থাৎ মাথা ও বক্ষ। স্বামীর সামনে কোন অঙ্গ আবৃত রাখা ওয়াজিব নয়। তবে বিশেষ অঙ্গকে দেখা অনুত্তম।

قالت سيدتنا ام المؤمنين عائشة ما رأيته منه ولم يرمني ذالك الموضع اورده في المشكواة وروى بقي بن مخلد وابن عدى عن ابن عباس مرفوعا اذا جامع احدكم زوجته اوجاريته فلا ينظر الى فرجها فان ذالك يورث العمى قال ابن صلاح جيد الاسناد كذا في الجامع الصغير- এবং (পর্দার প্রতি এতটুকু যত্নবান হতে পারে যে, চলার সময়) সজোরে পদক্ষেপ করবে না, যাতে তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ে (অর্থাৎ অলংকারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষদের কানে পৌঁছে যায়)। হে মুসলমানগণ, (এসব বিধানের ক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা যে ত্রুটি হয়ে গেছে, তজ্জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (নতুবা গোনাহ্ পূর্ণ সফলতার পরিপন্থী হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পর্দাপ্রথা নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ঃ মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহ্যাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারও মতে তৃতীয় হিজরী এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরী। তফসীরে ইবনে কাসীর ও নায়লুল আওতার গ্রন্থে পঞ্চম হিজরীকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীতে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিবাহের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদ ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এই আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সূরা নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পরে এবং সূরা আহযাবের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ আগে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহযাবের আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহযাবেই ইনশাআল্লাহ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়াতসমূহের তফসীর লিখিত হচ্ছে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى

يَغُضُّوا—لَهُم اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - শব্দটি غض থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কম করা এবং নত করা। ---(রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মকরূহ—এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখা-ও এর মধ্যে দাখিল (চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত)। এ ছাড়া কারও গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم—যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ—যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টত উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ—যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র) হযরত ওবায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, كل ما عصى الله به فهو كبيرة وقد ذكر الطرفين। অর্থাৎ যদ্দ্বারা আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত---সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

النظر سهم من سهام ابليس مسموم من تركها مخافتى ابدلته ايمانا يجد حلاوته فى قلبه ---দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর ওপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।---(ইবনে কাসীর) হযরত আলী (রা)-র হাদীসে আছে,

প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে গোনাহ্। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করারও বিধান অনুরূপ ঃ ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলিমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ঃ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ——এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু জোর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহ্রাম ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলিমের মতে নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম ; কাম-ভাব সহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হযরত উম্মে সালমার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ একদিন হযরত উম্মে সালমা ও মায়মুনা (রা) উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে সালমা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সে তো অন্ধ। সে আমা-দেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ।——(আবু দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েক-জন ফিকাহবিদ বলেন ঃ কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দূষণীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রসূলুল্লাহ (সা) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিষেধ করেন নি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। আয়াতের ভাষা দৃষ্টে আরও বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল

ও হাতের তালু ব্যতীত বাকীগুলো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরয। কোন পুরুষ কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোন নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরও সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থী। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ -

অভিধানে زِيْنَتْ এমন বস্তুকে বলা হয়, যদ্দারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্ত্রও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোন নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য হালাল; যেমন বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোন দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে زِيْنَتْ এর অর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার স্থান; অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজ-সজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের ওপর ওয়াজিব।---(রূহুল মা'আনী) আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে; একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসাবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসাবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম ঃ প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ নারীর কোন সাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গোনাহ্ নেই।---(ইবনে কাসীর) এতে কোন্ কোন্ অঙ্গ বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে-আব্বাসের তফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন ঃ مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত

বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজসজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা কোন নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদের তফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জায়েয নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। এ কারণে ফিকাহবিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েয নয় এবং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েয নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয এবং নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরয তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে।

কাযী বায়যাভী ও 'খাযেন' এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনকিছু প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ---গোনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েয ; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওযর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লিখিত উভয় তফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মযহাবও এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েয নয়। যাওয়াজের গ্রন্থে ইবনে হাজার মক্কী শাফেঈ (র) ইমাম শাফেঈ (র)-ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামায হয়ে যায় ; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েয নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকাহবিদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েয, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েয। বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা

অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েয নয়।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজসজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছেঃ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ---অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। خُمُر শব্দটি خِمَار এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্দ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جُيُوب শব্দটি جَيْب এর বহুবচন। এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীনকাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজসজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ মূর্খতাযুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। মূর্খতাযুগে নারীরা ওড়না মাথার ওপর ফেলে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পরে উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে।---(রূহুল মা'আনী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের কাছে শরীয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। এক. যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশঙ্কা নেই। তারা মাহ্‌রাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করেঃ স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নেই। দুই. সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহ্‌রামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম---গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে খোলা জায়েয নয়, তা দেখা মাহ্‌রামদের জন্যও জায়েয নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহ্‌রাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহযাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

হুশিয়ারীঃ স্মরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহ্‌রাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহবিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহ্‌রাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপঃ প্রথমত স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা

সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ ما رأى منى ولا رأيت منه অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেন নি এবং আমিও তাঁর দেখিনি।

দ্বিতীয়ত. পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়ত. শ্বশুর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থত, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চমত. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা। সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়র-মাহরাম। সপ্তম, ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম. ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোন বোঝানো হয়েছে।

এই আট প্রকার হলো মাহ্‌রাম। নবম. أَوْ نِسَائِهِنَّ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে —গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহ্‌রাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

نِسَائِهِنَّ—মুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফিরে মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, কাফির নারীর সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্য জায়েয নয়। কিন্তু সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ (সা)-র বিবিদের সামনে কাফির রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারও মতে কাফির নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফির উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী বলেনঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফির সব নারীই نِسَائِهِنَّ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফির নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। রূহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলূসী এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন ঃ

هذا القول اوفق بالناس اليوم فانه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات—অর্থাৎ এই উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফির নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

দশম প্রকার أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ—অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহ্‌রামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেনঃ لا يغرنكم اية النور فانه فى الاناث دون الذكور অর্থাৎ তোমরা সূরা নূরের আয়াতদৃষ্টে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, ما ملكت ايمانهن শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেনঃ পুরুষ দাসের জন্য তার প্রভু নারীর কেশ দেখা জায়েয নয়।---(রূহুল মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু নারী দাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী أَوْ نِسَائِهِنَّ শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেনঃ نِسَائِهِنَّ শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্য প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফিরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্য এই শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে।

একাদশ প্রকার أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ—হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে, যাদের নারীজাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই।---(ইবনে কাসীর) ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবূ আবদুল্লাহ্, ইবনে জুবায়র, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতিও কোন ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। হযরত আয়েশা (রা)-র হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এই কারণেই ইবনে হজর মক্কী মিনহাজের টীকায় বলেন ঃ পুরুষ যদিও পুরুষত্ব-হীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ শব্দের সাথে التَّابِعِينَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহূত মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহূত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার ওপর — অনাহূত মেহমান হওয়ার ওপর নয়।

দ্বাদশ প্রকার أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ — এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বোঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। —(ইবনে কাসীর) ইমাম জাসসাস বলেন ঃ এখানে طفل বলে এমন বালককে বোঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হল।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ — অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয়ঃ আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই ---গোপন সাজসজ্জা যে কোনভাবেই প্রকাশ করা হোক, তাও জায়েয নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরুন অলঙ্কার ঝঙ্কৃত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা কিংবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় ও বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে নাজায়েয। এ কারণেই অনেক ফিকাহ্‌বিদ বলেনঃ যখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হল, তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরও কঠোর এবং প্রশ্নাতীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নাওয়াযেল গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সম্ভব নারীগণকে কোরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাযে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লাহ্' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী আওয়াজ করতে পারবেন না; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধানঃ নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কি না এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। ইমাম শাফেঈর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম নাওয়াযেলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আযান মকরূহ। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশংকা নেই, সেখানে জায়েয। --- (জাসসাস) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়াঃ নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধিও গোপন সাজ-সজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌঁছা নাজায়েয। তিরমিযীতে হযরত আবু মূসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েয ঃ ইমাম জাসসাস বলেন ঃ কোরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র। ---(জাসসাস)

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ----অর্থাৎ মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি কারও দ্বারা কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্য তওবা করা নেহায়েত জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে।

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ

---

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুক্তদের মধ্যে) যারা বিবাহহীন (পুরুষ হোক কিংবা নারী বিবাহহীন হওয়াও ব্যাপক অর্থে---এখন পর্যন্ত বিবাহই হয় নি কিংবা হওয়ার পর স্ত্রীর মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে বিবাহহীন হয়ে গেছে) তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন

করে দাও এবং (এমনিভাবে) তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা এর (অর্থাৎ বিবাহের) যোগ্য, (অর্থাৎ বিবাহের হক আদায় করতে সক্ষম) তাদেরও (বিবাহ সম্পাদন করে দাও। শুধু নিজেদের স্বার্থে তাদের বিবাহের স্বার্থকে বিনষ্ট করো না এবং মুক্তদের মধ্যে যারা বিবাহের পয়গাম দেয়, তাদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার প্রতি লক্ষ্য করে অস্বীকার করো না যদি তাদের মধ্যে জীবিকা উপার্জনের যোগ্যতা থাকে, কেননা) তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিত্তশালী করে দেবেন। (মোটকথা এই যে, বিত্তশালী না হওয়ার কারণে বিবাহ অস্বীকার করো না এবং এরূপও মনে করো না যে, বিবাহ হলে খরচ বৃদ্ধি পাবে। ফলে এখন যে বিত্তশালী সেও বিত্তহীন ও কাঙ্গাল হয়ে যাবে। কারণ, আসলে আল্লাহ্র ইচ্ছার ওপরই জীবিকা নির্ভরশীল। তিনি কোন বিত্তশালীকে বিবাহ ছাড়াও নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত করতে পারেন এবং কোন দরিদ্র বিবাহওয়ালাকে বিবাহ সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা থেকে মুক্তি দিতে পারেন।) আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচুর্যময় (যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং সবার অবস্থা সম্পর্কে) জ্ঞানময়। (যাকে বিত্তশালী করা রহস্যের উপযোগী হবে তাকে বিত্তশালী করে দেন এবং যাকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত রাখাই উপযুক্ত, তাকে দরিদ্র রাখেন।) আর (যদি কেউ দারিদ্র্যের কারণে বিবাহের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী না হয়, তবে) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন প্রবৃত্তিকে বশে রাখে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। অভাবমুক্ত করা হলে বিবাহ করবে)।

বিবাহের কতিপয় বিধান ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা নূরে বেশীর ভাগ সতীত্ব ও পবিত্রতার হেফাযত এবং নির্লজ্জতা অশ্লীলতা দমন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এই পরম্পরায় ব্যভিচার ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির কঠোর শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর অনুমতি চাওয়া ও পর্দার বিধান বিধৃত হয়েছে। ইসলাম শরীয়ত একটি সুষম শরীয়ত। এর যাবতীয় বিধি-বিধানে সমতা নিহিত আছে। এক দিকে মানুষের স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং অপরদিকে এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই একদিকে যখন মানুষকে অবৈধ পন্থায় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, তখন স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর কোন বৈধ ও বিশুদ্ধ পন্থাও বলে দেয়া জরুরী ছিল। এছাড়া মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় সীমার ভেতরে থেকে নর ও নারীর মেলামেশার কোন পন্থা প্রবর্তন করাও যুক্তি ও শরীয়তের দাবি। কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় এই পন্থার নাম বিবাহ। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে স্বাধীন নারীদের অভিভাবক এবং দাস-দাসীদের মালিকদেরকে তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ —أَيَامَىٰ শব্দটি أَيِّم এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই; আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আযম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফু' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য যদি সে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেঈ ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিশ্চুপ; বিশেষত এ কারণেও যে, أَيَامَىٰ (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ—কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ? : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না

করলে শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্যও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরয অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ করবে না, ততদিন গোনাহ্গার থাকবে। হ্যাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে; যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোযা রাখবে। রোযার ফলে কামোত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়।

মসনদ আহ্মদে বর্ণিত আছে---রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওকাফ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেনঃ না। আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন শরীয়তসম্মত বাঁদী আছে কি? উত্তর হলঃ না। প্রশ্ন হলঃ তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল? উত্তর হলঃ হ্যাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হ্যাঁ বললে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরও বললেনঃ বিবাহ আমাদের সুন্নত। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে।--- মাযহারী)

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহ্র আশংকা প্রবল, ফিকাহ্বিদদের মতে এই হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জানা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মসনদ আহ্মদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।---মাযহারী) এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকাহ্বিদ একমত যে, কোন ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর ওপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোন গোনাহ্ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারাম অথবা মকরূহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার গোনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোন গোনাহের আশংকা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকাহ্বিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফার মতে নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেঈ বলেন, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সত্তাগতভাবে পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মুবাহ্ তথা শরীয়তসিদ্ধ

কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ্ করে যে, এর মাধ্যমে সে গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে, তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ সদুদ্দেশ্যে যে কোন মুবাহ্ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে মশগুল হওয়া আপন সত্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেঈ ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবূ হানীফার মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মোবাহ্ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ্ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গম্বরদের ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (স)-র সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এ সব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ্ সাধারণ মুবাহ্ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ্ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গম্বরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও নিদ্রাও পয়গম্বরগণের সুন্নত। কারণ, তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেন নি এবং কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গম্বরগণের সুন্নত। বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ্ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গম্বরগণেব সুন্নত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিজের সুন্নত বলা হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোন গোনাহ্তে লিপ্ত হওয়ার আশংকাও নেই, এরূপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ্ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার যিকর ও ইবাদতে অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ্ করা উত্তম। সকল পয়গম্বর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্রূপই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার এরূপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ্ ও পরিবার পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক যিকর ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ্ বর্জন উত্তম। কোরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ এতে নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র যিকর থেকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ---অর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস ও বাঁদীদের মধ্যে যারা যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও প্রভুদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। صالحين শব্দটি এ স্থলে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ স্ত্রীর বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মোহর আদায় করার যোগ্যতা। যদি صالحين শব্দের সুবিদিত অর্থ সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সৎ-কর্মপরায়ণদের মধ্যেই হতে পারে।

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাঁদীদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা প্রভুদের ওপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকাহ্-বিদের মতে তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করা। বরং অনুমতি দেওয়া প্রভুদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ, ক্রীতদাস ও বাঁদীদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কোরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ ---অর্থাৎ নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে।---(তিরমিযী)

সারকথা এই যে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত না করে সেইজন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের যিম্মায় ওয়াজিব——এটা জরুরী নয়। والله اعلم

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ---যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্মকর্মের হিফাযতের জন্য বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই ; আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হিফাযত ও সুন্নতে রসূল (সা) পালন করার সদুদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন।

যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানান উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন।---(ইবনে কাসীর)। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহ্র আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إن يكونوا فقراء يغنهم الله ---হযরত ইবনে মাসউদ বলেন ঃ তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ إن يكونوا-

فقراء يغنهم الله-(ইবনে কাসীর)

হুশিয়ারী ঃ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্মতর্ব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াত ঃ

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

অর্থাৎ যারা অর্থসম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশংকা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গোনাহ্গার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোযা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থসম্পদ দান করবেন।

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا
فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

(৩৩) তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে অর্থকড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের ওপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে (দাস হোক কিংবা দাসী) যারা মোকাতাব হতে ইচ্ছুক (উত্তম এই যে,) তাদেরকে মোকাতাব করে দাও যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ (অর্থাৎ কল্যাণের চিহ্ন) দেখতে পাও। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত অর্থসম্পদ থেকে তাদেরকেও দান কর (যাতে দ্রুত মুক্ত হতে পারে)। তোমাদের (অধিকারভুক্ত) দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না (বিশেষত) যদি তারা সতী থাকতে চায় (এবং তোমাদের এই হীন কর্ম) শুধু এ কারণে যে, তোমরা পার্থিব জীবনের কিছু উপকার (অর্থাৎ ধনসম্পদ) লাভ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে (এবং তারা বাঁচতে চাইবে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর জবরদস্তি করার পর (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদীদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাঁদীরা যদি মালিকদের সাথে মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ এই নির্দেশকে মুস্তাহাব স্থির করেছেন। অর্থাৎ

অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয়; কিন্তু মুস্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপঃ কোন গোলাম অথবা বাঁদী তার মালিককে বলবে, আপনি আমার ওপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি প্রভু ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব ও পেশ গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অঙ্ককে 'বদলে-কিতাবত' বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরীয়ত এর কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কম বেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরীকৃত হবে, তাই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামী শরীয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাঁদী মুক্ত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাঁদীর সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ ও তাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। যারা শরীয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদী, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে আগ্রহী। যাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদী মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং অধিকাংশ ইমাম এই কল্যাণের অর্থ বলেছেন উপার্জন-ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেনঃ এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা নেই; উদাহরণত সে কাফির হলে এবং তার কাফির ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতির আশংকাও না থাকা চাই।---(মাযহারী)

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ --- অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে

ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার ওপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত নয়। যাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিক-দেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরও কম হ্রাস করে দিতেন।---(মাযহারী)

অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা এবং সে সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা ঃ আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকাল বিস্মৃত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালিজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। একথা চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের ওপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনা ও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরোক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায় নি। এগুলোর কোন একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই। বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতটুকুই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, না এগুলো সাধারণ ওয়াকফ ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে?

প্রথম মতবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর ওপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধা-নিষেধ অসহনীয়। এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক ও কাফিরদের ছিল। তারা হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল ঃ এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েয-নাজায়েযের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন ? কোরআনের أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

দ্বিতীয় মতবাদ সোশ্যালিজম মানুষকে কোন বস্তুর ওপর কোপরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না ; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভুক্তও করে দেওয়া হল।

কোরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে মূলনীতি এই দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ্, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা, উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক জায়গায় হারাম। এছাড়া যে সব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ অর্থাৎ এই অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সেই ধন--সম্পদ থেকে দান কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এক, ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ্। দুই, তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন। তিন, তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু

বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, ওয়াজিব মুস্তাহাব, উত্তম করেছেন। والله اعلم এবং মূর্খতাযুগের কুপ্রথা উৎপাটন, ব্যভিচার ও নির্লজ্জতা দমন করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ অর্থাৎ তোমাদের বাঁদীদেরকে এ কাজে বাধ্য করো না যে, তারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থকড়ি উপার্জন করে তোমাদেরকে দেবে। মূর্খতা যুগের অনেক মানুষ বাঁদীদেরকে এ কাজে ব্যবহার করত। ইসলাম যখন ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি জারি করল এবং মুক্ত ও গোলাম নির্বিশেষে সবাইকে এর আওতাভুক্ত করে দিল, তখন এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ বিধান প্রদান করাও জরুরী ছিল।

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا——অর্থাৎ যদি বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার ও সতীত্ব রক্ষা করার ইচ্ছা করে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি করা খুবই নির্লজ্জ কাজ। বাক্যটি যদিও শর্তের আকারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সর্বসম্মত মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে এ শর্ত উদ্দেশ্য নয় যে, বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চাইলে তাদের ওপর জবরদস্তি করা জায়েয নয় এবং বাঁচতে না চাইলে জায়েয। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ চাল-চলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বাঁদীদের মধ্যে লজ্জাশরম ও সতীত্ব-বোধ মূর্খতাযুগে বিদ্যমান ছিল না। ইসলামী বিধানাবলী আগমনের পর তারা যখন তওবা করল, তখনও তাদের প্রভুরা অর্থাৎ ইবনে-উবাই প্রমুখ মুনাফিক জবরদস্তি করতে চাইল। এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য বিধান অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, তারা যখন ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চায়, তখন তোমরা তাদেরকে বাধ্য করো না। এতে করে তাদের প্রভুদেরকে শাসানো উদ্দেশ্য যে, বাঁদীরা তো সতীসাধ্বী থাকতে ইচ্ছুক, আর তোমরাই তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য কর——এটা নিরতিশয় বেহায়াপনার কাজ।

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ——এই বাক্যের সারমর্ম এই যে, বাঁদীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হারাম। কেউ এরূপ করলে এবং প্রভুর জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে কোন বাঁদী ব্যভিচার করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার গোনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং সমস্ত গোনাহ্ জবরকারীর ওপর বর্তাবে।——(মাযহারী)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ

قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ
مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۭ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۭ اَلزُّجَاجَةُ
كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ
يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْۗءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۭ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ۭ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ
مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾ ۙ
فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا
بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾ ۙ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ
اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۗءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ
وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ ۙ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ
وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ
كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۗءً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا
وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۭ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ ۙ اَوْ
كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۭ
ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۭ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۭ وَمَنْ
لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾

(৩৪) আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য দিয়েছি উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পূতঃপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের

জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৫) আল্লাহ্ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ; (৩৬) এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (৩৮) (তারা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ্ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান করেন। (৩৯) যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমন কি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহ্কে, অতঃপর আল্লাহ্ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার ওপরে ঘন কাল মেঘ আছে। একের ওপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (তোমাদের হিদায়তের জন্যে এই সূরায় অথবা কোরআনে রসূলুল্লাহ্ (সা) -র মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট (শিক্ষাগত ও কর্মগত) বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে,তাদের (অথবা তাদের মত লোকদের) কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্ভীরুদের জন্যে উপদেশ (অবতীর্ণ করেছি)। আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডলের (বাসিন্দাদের) এবং ভূমণ্ডলের (বাসিন্দাদের) জ্যোতি (অর্থাৎ হিদায়ত) দাতা। (অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা হিদায়ত পেয়েছে, তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলাই হিদায়ত দিয়েছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল বলে সমগ্র বিশ্ব বোঝানো হয়েছে। সুতরাং যেসব সৃষ্ট জীব নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাইরে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত আছে, যেমন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদল।) তাঁর জ্যোতির (হিদায়তের) আশ্চর্য অবস্থা এমন, যেমন (মনে কর) একটি তাক, তাতে একটি প্রদীপ (স্থাপিত)। প্রদীপটি (স্বয়ং তাকে স্থাপিত নয় ; বরং) একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত (এবং কাঁচপাত্রটি তাকে রাখা আছে)। কাঁচপাত্রটি (এমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ) যেন একটি উজ্জ্বল তারকা। প্রদীপটি একটি উপকারী বৃক্ষ (অর্থাৎ বৃক্ষের তৈল) দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়, যা যয়তুন (বৃক্ষ)। বৃক্ষটি (কোন আড়ালের) পূর্বমুখী নয় এবং (কোন আড়ালের) পশ্চিমমুখীও নয়। (অর্থাৎ এর পূর্বদিকে কোন বৃক্ষ অথবা পাহাড়ের অড়াল নেই যে, দিনের শুরুতে তার ওপর রৌদ্র পাতিত হবে না এবং তার পশ্চিম দিকেও কোন পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনশেষে তার ওপর রৌদ্র পড়বে না ; বরং বৃক্ষটি উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত, যেখানে সারাদিন রৌদ্র থাকে। এমন বৃক্ষের তৈল অত্যন্ত

সূক্ষ্ম, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এবং) এর তৈল (এতটুকু পরিষ্কার ও প্রজ্বলনশীল যে) অগ্নি স্পর্শ না করলেও মনে হয় যেন আপনা-আপনি জ্বলে উঠবে। (আর যখন অগ্নি স্পর্শ করে, তখন তো) জ্যোতির ওপর জ্যোতি। (অর্থাৎ একে তো তার মধ্যে জ্যোতির যোগ্যতা উৎকৃষ্ট স্তরের ছিল, এরপর আগুনের সাথেও মিলিত হয়েছে। মিলনও এমনভাবে যে, প্রদীপটি কাঁচপাত্রে রাখা আছে, যদ্দরুন চাকচিক্য দৃশ্যত আরও বেড়ে যায়। এরপর কাঁচপাত্রটি তাকে স্থাপিত আছে, যা একদিক থেকে বন্ধ। এমতাবস্থায় কিরণ এক স্থানে সংকুচিত হয়ে আলো অনেক তীব্র হয়ে যায়। তৈলও যয়তুনের, যা পরিষ্কার আলো ও কম ধোঁয়া হওয়ার জন্যে প্রসিদ্ধ। ফলে অনেকগুলো আলোর একত্র সমাবেশের ন্যায় প্রখর আলো হবে। একেই "জোতির ওপর জ্যোতি" বলা হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্ত সমাপ্ত হল। এমনিভাবে মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যখন হিদায়তের নূর সৃষ্টি করেন, তখন তার অন্তর দিন দিন সত্য গ্রহণের জন্যে উন্মুক্ত হতে থাকে এবং সর্বদাই আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত থাকে; যদিও কার্যত কোন কোন আদেশের জ্ঞান থাকে না। কেননা, জ্ঞান ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। যয়তুনের তৈল যেমন অগ্নি সংযোগের পূর্বেই আলো বিকীরণের জন্যে প্রস্তুত ছিল, তেমনি মু'মিনও নির্দেশাবলীর জ্ঞান লাভ করার পূর্বেই সেগুলো পালন করার জন্যে প্রস্তুত থাকে। এরপর যখন জ্ঞান হাসিল হয়, তখন কর্মের নূর অর্থাৎ পালন করার দৃঢ় সংকল্পের সাথে জ্ঞানের নূরও মিলিত হয়। ফলে, সে তৎক্ষণাৎ তা কবুল করে নেয়। সুতরাং কর্ম ও জ্ঞান একত্রিত হয়ে নূরের ওপর নূর হয়ে যায়। নির্দেশাবলীর জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর মু'মিন সত্য গ্রহণে কোনরূপ দ্বিধা করে না। এই উন্মুক্ততা ও নূর অন্য আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নূরের ওপর থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

মোটকথা, এ হচ্ছে নূরে হিদায়তর দৃষ্টান্ত।) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (এবং পৌঁছিয়ে দেন। হিদায়তের এই দৃষ্টান্তের ন্যায় কোর-আনে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারাও মানুষের হিদায়ত উদ্দেশ্য। তাই) আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের (হিদায়তের) জন্য (এসব) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (যাতে জ্ঞানগত বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর ন্যায় বোধগম্য হয়ে যায়)। আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয়ে জ্ঞাত। (তাই যে দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট, সেই দৃষ্টান্তই অবলম্বন করেন। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ খুবই যথোপযুক্ত হয়ে থাকে। এরপর হিদায়তপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) তারা এমন গৃহে (গিয়ে ইবাদত করে), যেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এবং আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন; (অর্থাৎ মসজিদসমূহ। মসজিদের সম্মান এই যে, তাতে নাপাক ও হায়েযওয়ালী প্রবেশ করবে না, কোন অপবিত্র বস্তু সেখানে নেয়া যাবে না,

গণ্ডগোল করা যাবে না, পার্থিব কাজ ও কথাবার্তা বলার জন্যে সেখানে বসা যাবে না, দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খেয়ে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। মোটকথা) সেগুলোতে (অর্থাৎ মসজিদসমূহে) এমন লোকেরা সকাল ও সন্ধ্যায় (নামাযে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ (অর্থাৎ নির্দেশাবলী পালন) থেকে এবং (বিশেষভাবে) নামায পড়া থেকে এবং যাকাত প্রদান থেকে (শাখাগত নির্দেশাবলীর মধ্যে এগুলো প্রধান) ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বিরত রাখে না। (আনুগত্য ও ইবাদত সত্ত্বেও তাদের ভয়ভীতি এরূপ যে) তারা সেই দিনকে (অর্থাৎ সেই দিনের ধরপাকড়কে) ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (যেমন অন্য আয়াতে আছে يؤتون ما اتو وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ---অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র পথে খরচ করে এবং এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তর কিয়ামতের ধরপাকড়কে ভয় করে। এখানে হিদায়ত ও নূর -ওয়ালাদের গুণাবলী ও কর্ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।) পরিণাম এই হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজ-কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবেন (অর্থাৎ জান্নাত দেবেন।) এবং (প্রতিদান ছাড়াও) নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেবেন। (প্রতিদান তো এটা ---যার ওয়াদা বিস্তারিত উল্লিখিত আছে, অধিক হল ---যার ওয়াদা বিস্তারিত নেই, যদিও সংক্ষিপ্ত আছে।) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, অগণিত (অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে) রুযী দান করেন। (সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে এমনিভাবে অপরিসীম দেবেন। এ পর্যন্ত হিদায়ত ও হিদায়ত-ওয়ালাদের বর্ণনা ছিল। অতঃপর পথভ্রষ্টতা ও পথভ্রষ্টদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা কাফির (পথভ্রষ্ট এবং নূরে-হিদায়ত থেকে দূরে) তাদের কর্ম (কাফিরদের দুই প্রকার হওয়ার কারণে দু'টি দৃষ্টান্তের অনুরূপ। কেননা, এক প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামত বিশ্বাসী এবং তাদের যেসব কর্ম তাদের ধারণা অনুযায়ী সওয়াবের কাজ, পরকালে সেগুলোর প্রতিদান আশা করে। দ্বিতীয় প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী। প্রথম প্রকার কাফিরদের কর্ম তো) মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে (দূর থেকে) পানি মনে করে (এবং তার দিকে দৌড় দেয়); এমন কি, সে যখন তার কাছে পৌঁছে, তখন তাকে (যা মনে করেছিল) কিছুই পায় না এবং) চরম পিপাসা তদুপরি নিদারুণ নৈরাশ্যের কারণে শারীরিক ও আত্মিক আঘাত পেয়ে সে ছটফট করতে করতে মারা যায়। এমতাবস্থায় বলা উচিত যে, পানির পরিবর্তে) আল্লাহ্র ফয়সালা অর্থাৎ মৃত্যুকে পায়। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা তার (জীবনের) হিসাব চুকিয়ে দেন (অর্থাৎ জীবন সাঙ্গ করে দেন)। আল্লাহ্ তা'আলা (যার মেয়াদ এসে যায়, তার) দ্রুত হিসাব (নিষ্পত্তি) করে দেন। (তাঁকে মোটেই ঝামেলা পোহাতে হয় না যে, দেরী লাগবে। সুতরাং এই বিষয়বস্তুটি এমন, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا আরও বলা হয়েছে : اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ

جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন মরীচিকাকে পানি মনে করে, তেমনিভাবে কাফিররা তাদের কর্মকে বাহ্যিক আকারে গ্রহণযোগ্য ও আখিরাতেও ফলদায়ক মনে করে এবং যেমন মরীচিকা পানি নয়, তেমনিভাবে তাদের কর্ম কবুলের শর্ত অর্থাৎ ঈমান না থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য ও ফলদায়ক নয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি মরীচিকার কাছে পৌঁছে যেমন আসল স্বরূপ জানতে পারে, তেমনিভাবে কাফির-রাও আখিরাতে পৌঁছে তার কর্ম ও বিশ্বাসের স্বরূপ জানতে পারবে। পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে হা-হুতাশ করতে করতে মারা গেল, তেমনিভাবে কাফিরও তার আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে চিরন্তন ধ্বংস অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে পতিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার কাফিরের কর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) অথবা তাদের (কর্ম কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে) গভীর সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ অন্ধকারের ন্যায়, (যার এক কারণ সমুদ্রের গভীরতা, তদুপরি) তাকে (অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিভাগকে) একটি বিশাল তরঙ্গ ঢেকে রেখেছে (তরঙ্গ ও একা নয়, বরং) তার (তরঙ্গের) ওপর অন্য তরঙ্গ (আছে, এরপর) তার ওপর কাল মেঘ আছে, যদ্দরুন তারকা ইত্যাদির আলোও পৌঁছে না। মোটকথা) ওপর-নীচে অনেক অন্ধকারই অন্ধকার। যদি (এমতাবস্থায় কোন লোক সমুদ্রের গভীরে হাত বের করে এবং তা দেখতে চায়) তবে (দেখা দূরের কথা) দেখার সম্ভাবনাও নেই। (এই দৃষ্টা-ন্তের সারমর্ম এই যে, যেসব কাফির পরকাল, কিয়ামত ও তাতে প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় অস্বীকার করে, তাদের কাছে কাল্পনিক নূরও নেই ; যেমন প্রথম প্রকার কাফিরদের কাছে একটি কাল্পনিক নূর ছিল। কেননা, তারা তাদের কতক সৎকর্মকে পরকালের পুঁজি মনে করেছিল, কিন্তু ঈমানের শর্ত না থাকার কারণে তা প্রকৃত নূর ছিল না—একটি কাল্পনিক নূর ছিল। পরকাল অস্বীকারকারীরা তাদের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী কোন কাজ পরকালের জন্যে করেইনি, যার নূরের কল্পনা তাদের মনে থাকতে পারে। মোটকথা, তাদের কাছে অন্ধকারই আছে, নূরের কল্পনাও তাদের কাছে হতে পারে না। সমুদ্রের গভীরতার দৃষ্টান্তে তাই আছে। না দেখা যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে হাতকে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হাত নিকটতম। এছাড়া একে যতই নিকটে আনতে চাইবে ততই নিকটে আসবে। এমতাবস্থায় হাতই যখন দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা বলাই বাহুল্য। অতঃপর এই কাফিরদের অন্ধকারে থাকার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, (যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নূর দেন না, সে (কোথা থেকেও) নূর পেতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতকে আলিমগণ 'নূরের আয়াত' বলে থাকেন। কেননা, এতে ঈমানের নূর ও কুফরের অন্ধকারকে বিস্তারিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

নূরের সংজ্ঞা ঃ নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী বলেন ঃ الظاهر بنفسه والمظهر لغيره অর্থাৎ যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, এমন সব বস্তুকে অনুভব করে ; যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের ওপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে ; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, 'নূর' শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন, বরং এগুলোর বহু উর্ধ্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার জন্যে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে 'মুনাওয়ের' অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য দানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে ; যেমন দানশীলকে 'দান' বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণশীলকে ন্যায়পরায়ণতা বলে দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ তাই, যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্ট জীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হিদায়তের নূর বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ الله هادى اهل السماوات والارض আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হিদায়তকারী।

মু'মিনের নূর ঃ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰوةٍ — মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার যে নূরে-হিদায়ত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইবনে-জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ

هو المؤمن الذى جعل الله الايمان والقران فى صدره فضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والارض فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من امن به فكان ابى بن كعب يقرأها مثل نور من امن به -

অর্থাৎ—এটা সেই মু'মিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও কোর-আনের নূরে-হিদায়ত রেখেছেন। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করে-ছেন الله نور السماوات والارض অতঃপর মু'মিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন مَثَلُ نُورِهِ উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের কিরআতও مَثَلُ نُورِهِ এর পরিবর্তে

مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ পড়তেন। সাঈদ ইবনে জুবায়র এই কিরআত এবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ مَثَلُ نُوْرِهٖ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। এক, এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র নূরে-হিদায়ত, যা মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত كَمِشْكٰوةٍ — এটা হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি। দুই, সর্বনাম দ্বারা মু'মিনকেই বোঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এই মু'মিন বোঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মু'মিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তুন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হিদায়তের দৃষ্টান্ত, যা মু'মিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তূন তৈল রাখা নূরে-হিদায়ত যখন আল্লাহ্‌র ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মু'মিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মু'মিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূরে-হিদায়ত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মু'মিনের অন্তরেই রাখা হয় না ; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় স্বভাবে এই নূরে-হিদায়ত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক ; কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই অস্বীকার করে!

একটি সহীহ্ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, كل مولود يولد على الفطرة — অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হিদায়ত। ঈমানের হিদায়ত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এই নূরে হিদায়তের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান

করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। মু'মিন ও কাফিরেরও প্রভেদ করা হয় নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে. يَهْدِى اللّٰهُ لِنُورِهٖ مَن يَشَاءُ ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহ্র ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কোর-আনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহ্র তওফীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়। কবি বলেনঃ

اذا لم يكن عون من الله للفتى
فاول من يجنى عليه اجتهاده

অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহায্য করা না হলে তার চেষ্টাই উল্টা তার জন্য ক্ষতিকর হয়।

নবী করীম (সা)-এর নূরঃ ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস কা'ব আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা'ব আহবার তওরাত ও ইন্জীলে সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেনঃ এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশ্কাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, زجاجة তথা কাঁচপাত্র মানে তাঁর পূত পবিত্র অন্তর এবং مصباح তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এই নবুয়তরূপী---নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'এরহাসাত' বলা হয়। কেননা, 'মু'জিযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলী বোঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এক ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'এরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'খাসায়েসে-কোবরা' গ্রন্থে, আবূ নায়ীম 'দালায়েলে-নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলিমও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তফসীরে-মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

যয়তূন তৈলের বৈশিষ্ট্য ঃ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ---এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলিমগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না---আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যয়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ।---(মাযহারী)

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ -

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে নিজের নূরে-হিদায়ত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন ঃ এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ্ চান ও তওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মু'মিনের আবাস-স্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মু'মিনের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়---সেইসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী فِىْ بُيُوْتٍ এর সম্পর্ক يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক يُسَبِّحُ উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী يُسَبِّحُ শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লিখিত আল্লাহ্ তা'আলার নূরে-হিদায়ত পাওয়ায় স্থান সেইসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদঃ আল্লাহ্র ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিবঃ কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

من احب الله عز وجل فليحبنى ومن احبنى فليحب اصحابى ومن احب اصحابى فليحب القران ومن احب القران فليحب المساجد فانها افنية الله اذن الله فى رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون اهلها محفوظة محفوظ اهلها هم فى صلاتهم والله عز وجل فى حوائجهم هم فى المساجد والله من وراءهم -

—যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কোরআনকে মহব্বত করে। যে কোরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। আল্লাহ্ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহ্র হিফাযতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহ্র হিফাযতে থাকে। যারা নামাযে মশগুল হয়, আল্লাহ্ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হিফাযত করেন।—(কুরতুবী)

رفع مساجد এর অর্থঃ أَذِنَ—أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ শব্দটি اذن থেকে উদ্ভূত। অর্থ অনুমতি দেওয়া। ترفع শব্দটি رفع থেকে উদ্ভূত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

ইকরামা ও মুজাহিদ বলেনঃ رفع বলে মসজিদ নির্মাণ বোঝানো হয়েছে; যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছেঃ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ এখানে رفع قواعد বলে ভিত্তি নির্মাণ বোঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী বলেনঃ رفع مساجد বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইয্যত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বোঝানো হয়েছে; যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে

মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন।---(ইবনে মাজা)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরী করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন।---(কুরতুবী)

প্রকৃত কথা এই যে, تُرْفَعَ শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই দাখিল আছে। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই দাখিল। এ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) রসুন ও পিয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুক্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তদ্রূপ নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধ যুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারুকে আযম বলেনঃ আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ্ (সা) যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পিয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেনঃ যে বক্তি রসুন-পিয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এই হাদীসের আলোকে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয় তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিত যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামায পড়া।

رفع مساجد এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত উসমান (রা) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর এ কাজ অপছন্দ করেন নি। পরবর্তী বাদশাহ্‌রা তো মসজিদ নির্মাণে অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তাঁর খিলাফতকালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিতকরণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানীর তিনগুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবু হানীফার মতে যদি নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহ্‌র নাম ও আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ

সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই ; বরং সওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফযীলত ঃ আবূ দাউদে হযরত আবূ উমামার বাচনিক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গৃহে ওযূ করে ফরয নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে ইহ্রাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্জের জন্য যায়। যে ব্যক্তি ইশরাকের নামায পড়ার জন্য গৃহ থেকে ওযূ করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব উমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাযের পরে অন্য নামায ইল্লিয়্যীনে লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।---(মুসলিম)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রার বাচনিক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পুরুষের নামায জামা'আতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামায পড়ার চাইতে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নত অনুযায়ী ওযূ করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাযের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্তবা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামা'আতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাযেরই সওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে---ইয়া আল্লাহ্, তার প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার ওযূ না ভাঙ্গে। হযরত হাকাম ইবনে ওমায়রের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ নম্রচিত্ত হও। আল্লাহ্র নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং (আল্লাহ্র ভয়ে) অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এরূপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মত্ত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। হযরত আবূ দারদা তাঁর পুত্রকে উপদেশ-চ্ছলে বলেন ঃ তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে শুনেছি-মসজিদ মুত্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে (অধিক যিকির দ্বারা) নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য আরাম, শান্তি ও পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার যিম্মাদার হয়ে যান। আবূ সাদেক ইজদী শোআয়ব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্রে লিখেছেন ঃ মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসজিদ পয়গম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ শেষ যমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে এবং দুনিয়ার ও তার মহব্বতের

কথাবার্তা বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা, এ ধরনের মসজিদে আগমনকারীদের কোন প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'আলার নেই।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন : যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বসল। কাজেই মুখ থেকে ভাল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বের না করা তার দায়িত্ব।—(কুরতুবী)

মসজিদের পনেরটি আদব : আলিমগণ মসজিদের পনেরটি আদব উল্লেখ করেছেন। (১) মসজিদে পৌঁছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ না থাকে, তবে السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين বলবে। কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের লোকগণ নফল নামায, তিলাওয়াতে-কোরআন, তসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় সালাম করা দুরস্ত নয়। (২) মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল-মসজিদ নামায পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাযের জন্য মকরূহ সময় না হয়; অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় না হওয়া। (৩) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। (৪) মসজিদে তীরতরবারি বের না করা। (৫) মসজিদে নিখোঁজ বস্তুর তল্লাশী ঘোষণা না করা। (৬) মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা না বলা। (৭) মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। (৮) মসজিদে বসার জায়গায় কারও সাথে ঝগড়া না করা। (৯) যেখানে কাতারে পুরাপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। (১০) নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। (১১) মসজিদে থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। (১২) অঙ্গুলি না ফুটানো। (১৩) শরীরের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা। (১৪) নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। (১৫) অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকা। কুরতুবী এই পনেরটি আদব লিখার পর বলেন : যে এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্ত পরিশোধ করে এবং মসজিদ তার জন্য হিফাযত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়। বর্তমান তফসীরকার মসজিদের আদব-কায়দা ও এ প্রাসঙ্গিক আহ্কাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন।

যেসব গৃহ আল্লাহ্র যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ : তফসীরে-বাহ্রে-মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন : কোরআনের فى بيوت শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বোঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়ায-নসিহত অথবা যিকরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, সেগুলোও বোঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানকাহ্ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

أَذِنَ اللّٰهُ বাক্যে أَذِنَ শব্দের বিশেষ রহস্য ঃ তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে أذن শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে امر ও حكم শব্দের পরিবর্তে أذن শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি? রাহুল-মা'আনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ ----এখানে তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহ্মীদ (প্রশংসা কীর্তন), নফল নামায, কোরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিকর বোঝানো হয়েছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ----যেসব মু'মিন আল্লাহ্ তা'আলার নূরে-হিদায়তের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে رجال শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে নামায পড়া উত্তম।

মসনদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ خير مساجد النساء قعر بيوتهن অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আয়াতে সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। বিক্রয়ও 'তিজারত' শব্দের মধ্যে দাখিল। তাই কোন কোন তফসীরবিদ মুকাবিলা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে তেজারতের অর্থ ক্রয় এবং بيع শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর بيع কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোন বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্র যিকর ও নামাযের মুকাবিলায় মু'মিনগণ কোন বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ এই আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেন ঃ একদিন আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর নামাযের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন ঃ এদের সম্পর্কেই কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন ও অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ওজন করার সময় আযানের শব্দ শ্রুতিগোচব হলে তিনি দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাযের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আযানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে কাঁধের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাযে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পসন্দ করতেন না। তাঁদের প্রশংসায়ই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছি।—(কুরতুবী)

অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামই ব্যবসাজীবী ছিলেন ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হত। কেননা, আল্লাহ্র স্মরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা এ কথা বলা অনর্থক হবে।---(রুহুল মা'আনী)

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত মু'মিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্র যিকর, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্যও হয়ে যায় না; বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত নূরে হিদায়তেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা হয়েছে وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ্ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন।

وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কোন সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিসীম রুযী দান করবেন। এ পর্যন্ত যে সব সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনের বক্ষ নূরে-হিদায়তের তাক এবং যারা বিশেষভাবে নূরে-হিদায়তকে গ্রহণ করে, সেই সব মু'মিনের

আলোচনা ছিল। অতঃপর সেই সব কাফিরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নূরে-হিদায়তের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু তখন এই উপকরণকে ঔজ্জ্বল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌঁছল না, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা কাফির ও অস্বীকারকারী—এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাই দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। উভয় দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে : وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যে, কাফিররা নূরে-হিদায়ত থেকে বঞ্চিত। তারা আল্লাহ্র বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। আল্লাহ্র নূর কোথায় পাবে?

আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা নিরেট আল্লাহ্র দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে।—(মাযহারী)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ۖ
كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾ وَلِلّٰهِ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ
يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ
يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ